ধর্ম, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা

শহিদুল ইসলাম

সূচনাবক্তব্য

১.

শিরোনামে 'বিজ্ঞান' শব্দটি দুবার ব্যবহার করা হয়েছে। তদুপরি আমি একজন বিজ্ঞানের ছাত্র। তাই এরূপ ধারণার জন্ম নেওয়া অসম্ভব নয় যে আজকের লেখাটি বিজ্ঞান বিষয়ক। মোটেই তা নয়। আজকের লেখার মধ্যে বিজ্ঞান নাই। আছে মূলত দর্শন, সেইসঙ্গে ইতিহাস। দর্শন ও ইতিহাসে কোনরকম ট্রেনিং না থাকা একজন বিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে বিষয়টা যে কতটা বিপজ্জনক, তা পাঠকেরা হয়ত উপলব্ধি করতে পারবেন। বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে ১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোনস কোলকাতায় এতদঅঞ্চলের ইতিহাস গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত এটি একটি ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্র। সাধারণভাবে ইতিহাস সম্পর্কে আমরা যা বুঝি, তা নিয়ে কাজ করা খুব একটা কষ্টকর মনে হয় না। কিন্তু 'ইতিহাসের দর্শন'-এর কথা উঠলে থমকে দাঁড়াতে হয়। তখন আর বিষয়টা অত সহজ-সরল থাকে না। ইতিহাসের সঙ্গে তখন সমাজ-সংগঠন, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, রাজনীতি সব একাকার হয়ে কাজটি কঠিনতর করে তোলে। ঠিক আজকের বিষয়টিও তেমনি জটিলতর। আমার পক্ষে এই শিরোনামের পক্ষে কতটা সুবিচার করা সম্ভব, সে সন্দেহ মাথায় রেখেই কিছু কথা আজকের এই পন্ডিত মহলে বলার চেষ্টা করবো। তাই প্রথমেই একজন বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও এই অসীম ধৃষ্টতার জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

২.

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ বছরে বিজ্ঞানের জগতে এক বিরাট বিপ্লব ঘটে গেছে। T.S. Kuhn এর ভাষায় এই ত্রিশ বছরে এক নতুন 'প্যারাডাইমের' জন্ম হয়েছে।[১] বিজ্ঞানের অধিবিদ্যক রূপটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং বিজ্ঞান একটি চঞ্চল, সদা-পরিবর্তনশীল একটি কর্মকান্ডে পরিণত হয়েছে। সেই বিপ্লব "led to the ideas of science as being in constant flux."[২] এমনি একটি সদা-পরিবর্তনশীল, যা অনবরত রূপ বদলায় সেরকম একটি প্রপঞ্চের সংজ্ঞা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। তাই বিশ-শতকের দু'জন দিকপাল বিজ্ঞানের ইতিহাস রচয়িতা জর্জ সার্টন[৩] এবং জে. ডি. বার্নাল[৪] কেউই বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা করেননি। সার্টন বলছেন "It (seience) began whenever and whatever men tried to solve the innumerable problems of life."[৫] জন্ম থেকেই মানুষ হাজারটা সমস্যায় জর্জরিত। তার মধ্যে প্রধান যে অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্কট তা বোধহয় ভুল নয়। মানুষ নিজেই যদি না বাঁচে তাহলে আর কি থাকে! তাই মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের মধ্য থেকেই বিজ্ঞানের উদ্ভব। কাজেই সে চেষ্টা না করাই ভাল। তবে আমার মনে হয় মূল লেখায় ঢোকার আগে সামান্য ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখা অপ্রয়োজনীয় হবে না। বিজ্ঞানের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের মধ্যে যেমন বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে তেমনি বিজ্ঞানমনস্কতার বা তার বিরোধী মনোভাবের একটি রূপরেখাও সে আলোচনায় উঠে আসবে বলেই আমার মনে হয়।

৩.

২০০৭ সালের কোন এক সময়ে বাংলাদেশের কোন এক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ‘বিজ্ঞানের দর্শন’-এর ওপর একটি বক্তৃতা দেবার জন্য। সেদিন আমার সঙ্গে আর মাত্র একজন বক্তা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অণুষদের প্রবীণতম অধ্যাপকদের একজন। তিনি সেদিন যা বললেন তা আমাকে হতবাক করেনি। কারণ সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের কোন এক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদে শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা আমাকে বলে দেয় আমাদের দেশের তথাকথিত বিজ্ঞান-শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্রগুলি এ ধরনের পন্ডিতের দ্বারা পরিপূর্ণ। তিনি বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিহীন কোরানের আয়াতের উল্লেখ করেন এবং এই বলে শেষ করেন যে, “আমার মন আছে বলেই পৃথিবীতে বস্তুরাশির অস্তিত্ব আছে।” সামনে দর্শন বিভাগের ছাত্র শিক্ষকরা চুপ করে তাঁর বক্তব্য শুনছিলেন। আমার বক্তৃতার এক পর্যায়ে সেদিন শ্রোতাদের যে প্রশ্ন করেছিলাম আজ আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে সেই প্রশ্নটি উত্থাপন করে এই অংশের কথা শুরু করি। আমি সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম “আপনারা কি বিশ্বাস করেন যে আমি আছি বলেই আপনারা আছেন? আমার অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের সঙ্গে আপনাদের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব সম্পর্কিত? আমি না থাকলে আপনাদের কোন অস্তিত্ব থাকবে না?” উপস্থিত সবাই সেদিন একবাক্যে বলে উঠেছিলেন “না।” অর্থাৎ আমার অস্তিত্বের সাথে তাদের অস্তিত্বের কোন সম্পর্ক নাই। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এবং তার অভ্যন্তরে যাবতীয় বস্তুরাশি ‘আমি’ নিরপেক্ষ। অর্থাৎ বস্তুরাশির অস্তিত্ব মানব-নিরপেক্ষ। এটাই বিজ্ঞানের প্রথম ও প্রধান দর্শন। সে কথায় পরে আসি। মানুষ যখন থেকে চিন্তা করতে শিখেছে, তখন থেকেই এই প্রশ্নটিকে ঘিরে বিজ্ঞজনেরা চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেছেন। সেইসঙ্গে আরো যেসব প্রশ্ন মানুষকে ভাবিয়েছে তাহল ‘বস্তুরাশির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি?’ ‘জ্ঞান কি?’ ‘জ্ঞানের উৎস কি?’ ‘জ্ঞান ও সত্য কি এক?’ ‘সব জ্ঞানই কি সত্যি?’ ‘সব সত্যি কি জ্ঞান?’ ‘মনের কি কোন আলাদা সত্তা আছে?’ ‘বস্তু বা মনের সম্পর্কই বা কি?’ ‘বস্তু মনকে নিয়ন্ত্রণ করে নাকি মন বস্তুকে?’ এমনি সব প্রশ্নে বিজ্ঞজনেরা প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল ‘মন’কে প্রাধান্য দেন। সেই অধ্যাপকের মত মনে করেন ‘মন আছে বলেই বস্তুরাশির অস্তিত্ব আছে।’ দর্শনের জগতে এরা ভাববাদী বলে পরিচিত। অন্য দলের মতে ‘বস্তু’ই প্রধান। বলেন ‘বস্তুই মন বা বিশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে।’ দর্শনে এরা ‘বস্তুবাদী’ বলে পরিচিত।

৪.

সভ্যতার সূচনালগ্ন কিংবা তারও আগে থেকে সমগ্র বিশ্ব ছিল এক ‘ধর্মীয় বিশ্বছবি’র অধীন। তখন মানুষের বস্তুজ্ঞান ছিল নিম্ন পর্যায়ে। প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটত তার পিছনে কোন এক অতিপ্রাকৃত শক্তিকে খুঁজে ফিরত সেদিনের বিজ্ঞজনেরা। সর্বপ্রাণবাদী ধর্মে প্রকৃতির প্রত্যেকটি ঘটনার পিছনে এক বা একাধিক দেবদেবীর উপস্থিতি কল্পনা করত সেদিনের মানুষ। সূর্য ছিল ফোয়েবাসের রথ। সেই রথে চড়ে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে বেড়াত। দেবতা জিউস বা থোরের শক্তিশালী অস্ত্র ছিল মেঘগর্জন ও বিদ্যুত-ঝলকানি। বরূন ছিল বৃষ্টির দেবতা। এদের তুষ্ট করে মানভঞ্জন করাই ছিল সেদিনের ধর্মবেত্তাদের প্রধান কর্ম। ‘অনস্তিত্ব’ দেবদেবীর অস্তিত্ব তাদের কাছে ছিল সন্দেহের অতীত। সেইসব অস্তিত্বহীন দেবদেবীর অস্তিত্ব তাদের কাছে ছিল অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যির চেয়েও সত্যি। একান্তভাবে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল মানবজাতির জন্য সেটাই ছিল যৌক্তিক বিশ্বাস-অবিশ্বাস।[৬] ও সেই সব প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণকারী দেবদেবীদের তুষ্ট করার জন্য সৃষ্টি হয় নানাধরণের ম্যাজিক, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং ধর্মীয় মতবাদ। তাই বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই ম্যাজিক, জ্যোতিষশাস্ত্র, ধর্ম ও দর্শনের কথা এসে যায়। বিজ্ঞানকে বুঝতে হলে সমাজ পরিবর্তনে এসব অনুষজ্ঞগুলির উৎপত্তি ও বিনাশের আলোচনা অপরিহার্য।

৫.

সাত/আট হাজার বছর আগে কৃষির আবিষ্কার ও বন্যপশুর গৃহপালন সমাজে এক গুণগত পরিবর্তন ঘটায়। এক নতুন প্যারাডাইম মানুষের চিন্তাভাবনা, সমাজ-সংগঠন, সবকিছুর এক বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটায়। সে আবিষ্কার মানবজাতির এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী আবিষ্কার। মানুষের শিকারী ভবঘুরে জীবনের অবসান ঘটে। আবাদী জমিকে কেন্দ্র করে মানুষ এক জায়গায় স্থিত হয়। মানুষের জীবনযাত্রায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনে। যাযাবর জীবনের বহু দেবদেবীভিত্তিক হোমারের বিশ্বছবি নতুন সমাজ বাস্তবতায় অনুকূল মনে হয় না। প্রয়োজন দেখা দেয় কেন্দ্রীভূত এক সমাজ ব্যবস্থার বিশ্বছবি। দু/তিনশ বছর কৃষি-ভিত্তিক স্থায়ী সমাজে বসবাস করার ফলে মানুষের মন থেকে শিকারী যাযাবর জীবনের ছবি ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে। নতুন সমাজ কাঠামো মানুষের চিন্তার জগতে এক নতুন দর্শনের জন্ম দেয় যা কিনা শিকারী জীবনের দর্শন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। জমির পরিচর্যা, পশুপালন, ফসলবোনা, ফসলতোলা ইত্যাদি কাজই হয়ে ওঠে মানুষের জীবনের প্রথম দায়িত্ব। নতুন সমাজ কাঠামো মানুষের মনে স্বতঃসিদ্ধ এক সমাজ কাঠামো হিসেবে স্থান করে নেয়। সেইসঙ্গে চিন্তার জগতেও আসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

৫/৬ খ্রিঃ পূর্বাব্দে উপরিউক্ত প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যা নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হন বেশ ক'জন ধর্মপ্রচারক। আশ্চর্যের বিষয় সেইসব আদি ধর্ম প্রচারকবৃন্দ কেউ ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে দাবি করেনি কিংবা ঈশ্বরের বাণী বহন করে এনেছেন এমন দাবি করতে সাহস পাননি। বরং তাদের বলা যায় পরবর্তী দার্শনিক নামধারী পন্ডিতজনের পূর্বসূরী। তাঁদের কাছে যুক্তিই ছিল মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। তাই তাঁরা মানুষের 'যুক্তিবোধের' কাছে আবেদন জানান। তারা পুরনো গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের ধর্মমতগুলিকে আক্রমণ করেন। চীনে লাউ-সে এবং কনফিউসিয়াস ষষ্ঠ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে যৌক্তিক নৈতিকতা শিক্ষা দেবার জন্য – তাওইজম ও কনফিউসিয়ানিজম ধর্ম প্রচার করেন। প্রায় একই সঙ্গে ভারতবর্ষে গৌতমবুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্মের বর্ণভেদ প্রথার বিরূদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং মানব জাতিকে তার জন্ম-মৃত্যুর পূর্বনির্ধারিত বর্ণভেদের অচলায়তনের দেয়াল ভেঙ্গে মুক্ত করেন এবং কাজের ওপরই যে মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্ণীত হয় সে শিক্ষা দেন। নৈতিক-গুণাবলীই ছিল তার প্রথম ও প্রধান শিক্ষা। ওদিকে ইরানের পুরনো ধর্ম থেকে বহু-ঈশ্বরবাদ, অসূর-পূজা, ম্যাজিক ও আচার পরায়ণতার দূর করার জন্য আবির্ভূত হন জরথুস্ট্র। তিনি শিক্ষা দেন পুরনো যুগের গোষ্ঠি-ঈশ্বরগণ ছিল অশুভ শক্তি। তিনি সার্থক ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নরবলী দেবার প্রথার সমালোচনা করেন এবং দাবি করেন একজন ঈশ্বরের ওপর সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। তিনি স্বর্গ-নরকের ধারণার সৃষ্টি করেন। কেন্দ্রীভূত এক সমাজ বাস্তবতায় তারও আগে অবতীর্ণ হয় একেশ্বরবাদী পুরোন বাইবেল। নতুন হিব্রু পয়গম্বর আমোস, হোসিয়া, ইসা বহু-ঈশ্বরবাদ, মূর্তিপূজা এবং ম্যাজিক ইত্যাদিকে আক্রমণ করেন।[৭]

৬.

একই শতকে গ্রিসের আমোনিয়ায় জন্ম নেন 'প্রাকৃতিক দর্শনের' (বিজ্ঞান) জনক বলে খ্যাত থেলিস (৬২৪-৫৪০ খ্রিঃ পূঃ)। বিজ্ঞানের ইতিহাসে থেলিস একটি মাইল ফলক। অনেকে তার আগের সময়কে 'প্রাকবৈজ্ঞানিক যুগ' বলে বিবেচনা করেন। যদিও সে যুগে মানুষ অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে। যেমন আগুন, কৃষি, পশুপালন, তামা-লোহা-নিষ্কাশন পদ্ধতি এবং ব্রঞ্জ তৈরির কলাকৌশল, এলকোহল, পাকা চামড়া, চাকা, নৌকা, ক্যালেন্ডার এমনি আরো অনেক কিছু। কিন্তু তবুও থেলিসকেই বিজ্ঞানের জনক হিসেবে মেনে নেবার কারণ কি? কারণ তিনি সমস্ত 'বস্তুরাশি'র মধ্যে একটি ঐক্যের সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিলেন এবং সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে পৃথিবীর সমস্ত 'বস্তুরাশি' একটি মাত্র বস্তু থেকে তৈরি এবং সে বস্তুটি পানি। এরপর শুরু হয়ে যায় খোজাখুঁজির পালা। কেউ বলেন

পানি, কেউ বাতাস, কেউ মাটি, কেউ বা আগুন। কেউ এই চারটিকে মৌলিক বস্তু বলে মেনে নেন। যেমন এরিস্টটল। প্রায় তিন/চারশ বছর এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক অব্যাহত থাকে। এই তিনশ বছরে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন প্যারাডাইমের জন্ম হয়। আর একটি মৌলিক বিপ্লব। কৃষি সভ্যতার-অবশ্যসম্ভাবী-ফল হিসেবে ক্রীতদাস প্রথার উন্মেষ ঘটতে থাকে। সে ক্রীতদাস-নির্ভর সমাজের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য দর্শনের জন্ম হয়। যুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে উপরিউক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজে দর্শন। সেইসঙ্গে ক্রীতদাস প্রথার যৌক্তিকতা। বিশ্বাস-নির্ভর ধর্মের সঙ্গে যুক্তি নির্ভর দর্শনের এক সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ডেমোক্রিটাসের প্রকৃতি দর্শনের বিরুদ্ধে প্লেটোর অবস্থানের কথা সর্বজনবিদিত। এ্যরিস্টটলও মনে করতেন সক্রেটিস-পূর্ব প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা কেবল প্রকৃতি নিয়েই ভাবতেন – তাদের মধ্যে কোন ঈশ্বর ভাবনা ছিলনা।

৫ম-৬ষ্ঠ খ্রিঃ পূর্বাব্দে কলোফোনে জন্মগ্রহণ করেন জেনোফেন। তাঁর সম্বন্ধে না বললে বিজ্ঞানের কথা অসমাপ্ত থেকে যায়। কারণ তিনিই ছিলেন "one of the first critics of anthropomorphism and mythology." সেই সময় তিনি যে চিন্তা করেছিলেন, ভাবলে আজ অবাক হতে হয়। তিনি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে মানুষই তার নিজের চেহারার মত করে ঈশ্বর সৃষ্টি করে। আরো বলেন যে অন্য কোন পশু-প্রাণীর যদি ঈশ্বর থাকত তাহলে তাদের ঈশ্বরের চেহারা তাদের মতই হত।[৮] যা হোক সেই ধারাবাহিকতায় লিউসিপ্পাস (৫০০–৪০০) ও ডেমোক্রিটাস (৪৬০–৩৭০) এটমের প্রস্তাব করেন। কোন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া তাঁরা কেবল যুক্তির সাহায্যে এটমের অস্তিত্ব কল্পনা করেছিলেন। বস্তুর সর্বকনিষ্ঠ অংশ, এখনকার ভাষায় বলা যায় 'মৌলিক-কণিকা' যা ভাঙ্গা যায়না। তারপর প্রায় আড়াই হাজার বছর অভঙ্গুর এটম বিজ্ঞানীদের মস্তিষ্ক দখল করেছিল। ১৮৯৭ সালে J. J. Thomson ইলেক্ট্রন আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রমাণ করলেন এটম অভঙ্গুর কিংবা বস্তুর সর্বকনিষ্ঠ অংশ নয়। বরং আরো ক্ষুদ্রতর কণিকার দ্বারা গঠিত একটি পদার্থ।

আগেই 'ভাববাদ' ও 'বস্তুবাদের' কথা বলেছি। ধর্ম হচ্ছে ভাববাদের সর্বোচ্চ রূপ। সেখানে যুক্তির কোন স্থান নেই। যুক্তিহীন বিশ্বাসই হল ধর্মের প্রধান শক্তি। কিন্তু দর্শন তা নয়। 'মন' 'সত্তা' আগে না 'বস্তু' আগে তা দর্শনের অন্যতম প্রধান অনুসন্ধানের বিষয়। যুক্তির সাহায্যে দার্শনিকগণ তাঁদের নিজেদের দার্শনিক তত্ত্ব নির্মান করেন। ধর্মে 'ভাববাদী' কিংবা 'বস্তুবাদী' এমন কোন বিভক্তি নাই। ধর্ম নির্ভেজাল ভাববাদী। তাই প্রথম কয়েকশ বছর দর্শনের সঙ্গে ধর্মের চলেছিল এক নিরবচ্ছিন্ন লড়াই। সে লড়াই-এর প্রথম শহীদ সক্রেটিস। হাজার হাজার যুক্তিবাদী মানুষ ধর্ম-বিশ্বাসের যুপতলে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। ধর্ম ও প্লেটোবাদের (যুক্তিবাদ) মধ্যে সুরহা করার জন্য জন্ম হয় 'নিও-প্লেটোবাদী' দর্শন। সেন্ট অগাস্টিন সেই দর্শনের প্রথম সার্থক রূপকার। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে যুক্তির সমন্বয় করতে গিয়ে ক্ষতি হল যুক্তিবাদের। ৫২৯ খ্রিস্টাব্দে প্লেটোর 'একাডেমী' বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সেইসঙ্গে 'বেনেডিক্টাইন' আদেশের মাধ্যমে প্রথম 'মঠ' প্রতিষ্ঠা হয়। এভাবে ৫২৯ সালে গ্রিক-দর্শনের ওপর খ্রিস্টীয় চার্চের ভারী-ঢাকনা চাপা দেওয়া হয়। শুরু হয় মধ্যযুগের অন্ধকারময় খ্রিস্টীয় চার্চের একাধিপত্য। শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ সমাজের যাবতীয় কিছুর ওপর মঠ সমূহের একক কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। মধ্যযুগ থেকে এভাবে বিজ্ঞান তিরোহিত হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের আলো নিবু নিবু জ্বলতেই থাকে। কারণ মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। তার জন্য বস্তু নিয়ে নাড়াচাড়ার কখনও শেষ হয়না।

৭.

কিন্তু বিজ্ঞান নির্ভেজাল বস্তুতান্ত্রিক। বস্তুহীন বিজ্ঞান কল্পনাতীত। বিজ্ঞানেও ভাববাদী ও বস্তুবাদী এমন কোন বিভাজন নাই। বিজ্ঞান একশভাগ বস্তুবাদী। আমরা দেখেছি গ্রিক সভ্যতার শুরুটা ভালই ছিল। থেলিস, লিউসিপ্পাস, ডেমোক্রিটাস, এ্যানাক্সোগোরাস,

এ্যানাক্সিমিনস, জেনোফেন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দার্শনিকের হাতে বিজ্ঞানের আদি রূপের উন্মেষ ঘটতে থাকে। তাঁদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু আধিভৌতিক কোন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নয়, তাদের আগ্রহের প্রধান জায়গা প্রকৃতি অর্থাৎ বস্তু। যুক্তির মাধ্যমে প্রকৃতির অদৃশ্য রহস্য উদঘাটনে তাঁরা যত্নবান হন এবং অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন। রোদ-বৃষ্টি-জল-ঝড়-ভূমিকম্প-অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কারণ তাঁরা প্রকৃতির মাঝেই খোঁজেন। হিপোক্রেটিস (৪৬০–৩৭৭ খ্রিঃ পূঃ) গ্রিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরু ও পাশ্চত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক। তাই তাঁরা সবাই 'প্রকৃতি দার্শনিক'। তাদের সে অনুসন্ধানের প্রধান অস্ত্র ছিল যুক্তি এবং সে যুক্তির প্রয়োগ দেখে আইনস্টাইন বিস্মিত হয়েছিলেন।

আগেই বলেছি শুরু থেকেই বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির এক অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম শুরু হয়। কিন্তু বিজ্ঞান যত শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে, বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে বিরোধ ততই হ্রাস পেতে থাকে এবং এক সময় বিশ্বাস ও যুক্তি তাদের বিরোধ মিটিয়ে নেয় এবং বস্তুবাদী বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতা শুরু করে। মধ্যযুগের শুরুতে আমরা সেন্ট অগাস্টিনের কথা জেনেছি। ইটালির রেনেসা শুরুর সমান্য আগে সামন্তবাদী ইউরোপের সমাজে ও অর্থনীতিতে যখন পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, আরবি ও ফারসি ভাষায় প্রাচীন গ্রিক বিজ্ঞান যখন পুনরাবিষ্কার হতে শুরু হয়েছে, মধ্যযুগের অন্ধকারের মধ্য থেকে প্লেটো, এরিস্টটল ও টলেমীর নাম যখন আলোয় উঠে আসছে, ঠিক তখন মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় দার্শনিক সেন্ট টমাস এ্যাকুইনাস (১২২৫-৭৪ খ্রি) এরিস্টটলের বিজ্ঞানের সঙ্গে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের সমন্বয় সাধনে ব্রতী হন এবং নিও-এরিস্টটলবাদের জন্ম দেন। কিন্তু তাঁর আগে বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইবনে রুশদ (১১২৬–১১৯৮ খ্রিঃ) এরিস্টটলের দার্শনিক মতবাদ সমর্থন করেন এবং গোড়া ধর্মীয় পন্ডিত ইমাম গাজ্জালির কোপানলে পড়েন। এরিস্টটল বিশ্বাস করতেন বিশ্ব ও বস্তুজগৎ নিত্য ও শাশ্বত – অনাদিকাল থেকেই বিদ্যমান। আত্মা ও দেহ একই বস্তু। তাই দেহের মৃত্যুর সাথে সাথে আত্মারও মৃত্যু ঘটে। এমত কেতাবি ধর্ম-বিরোধী। রুশদ বস্তুর নিত্যতা ও ব্যক্তিগত আত্মার নশ্বরতার কথা প্রচার করেন। বলেন বস্তু নিত্য এবং সৃষ্টিবাদ সর্বৈব মিথ্যা। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ড কতকগুলি সুসংবদ্ধ নীতি ও নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। এতে কেবল মুসলিম ধর্মবেত্তারা নন, খ্রিস্টীয় ধর্মযাজরাও ইবনে রুশদের ওপর দারুন ক্ষেপে গেলেন। ১২১০ খ্রিস্টাব্দে রুশদ-চর্চা নিষিদ্ধ হয়। ১২৩১ সালে পোপের নির্দেশে রুশদের বই পড়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।[৯] সেন্ট টমাস এ্যাকুইনাস নিজেও ইবনে রুশদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন এবং ভিন্ন পথে এরিস্টটলের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে তাঁর 'স্কলাসটিসিজম' দর্শনের ভিত স্থাপন করেন। এভাবে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন শেষমেশ বিজ্ঞানেরই ক্ষতি করে। 'স্কলাসটিসিজম' বিজ্ঞান চর্চার পথ অবরুদ্ধ করে দেয়।

অনেকে মনে করেন ১৫৪৩ সালে কপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বব্রহ্মান্ড আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু। কেউ কেউ মনে করেন ১৫১৭ সালে চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাই ইউরোপে আধুনিকতার জন্ম দেয়। এভাবে কোন ব্যক্তি বিশেষের আবিষ্কার বা কৃতিত্ব বড় করে দেখার চাইতে সমাজের ও অর্থনীতির সামগ্রিক রূপান্তরের কথা স্মরণ করা বিজ্ঞানসম্মত। একথা মিথ্যা নয় যে নিজে একজন যাজক হয়েও কপারনিকাস শুধু এরিস্টটল ও টলেমির বিজ্ঞানকেই মিথ্যা প্রমাণ করলেন তা নয়, তিনি বাইবেলের একটি গল্পকেও মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করেন। বিজ্ঞানের জগতে এটা আর একটি নতুন প্যারাডাইম বা বিপ্লব। কিন্তু সমাজে অর্থনীতির পরিবর্তনও দ্রুত ঘটছিল। পুঁজিবাদ ক্রমশ সামন্তবাদকে সরিয়ে দিচ্ছিল। সেই পুঁজিবাদই আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। প্রগতিশীল সেই পুঁজিবাদ সম্প্রসারণের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের মিলন ঘটে। তাই রেনেসাঁর পর ইউরোপের সমাজে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডের সমাজে পরিবর্তনের জোয়ার আসে। এক নতুন প্যারাডাইমের সৃষ্টি হয়। রেনেসাঁ, ধর্মসংস্কার ও শিল্পবিপ্লবের পথ পাড়ি দিয়ে পুঁজিবাদের স্থিত হতে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় লেগে যায়। সামন্তবাদী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানা ধরনের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদকে তার যৌক্তিক জায়গায় পৌছাতে হয়।

সেইসঙ্গে ১৬২০ সালে ফ্রান্সিস বেকনের 'নোভাম অর্গানাম' স্কলাসটিসিজমের ওপর বড় রকমের আঘাত হানে। বেকন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নির্ভর আরোহী পদ্ধতির প্রস্তাব করেন এবং আধুনিক বিজ্ঞানের পথ সুপ্রশস্ত করেন। সেই পথ ধরে ১৭ শতকের শেষে নিউটনের আবির্ভাব। আর এক নতুন প্যারডাইম। প্রায় দু'শ বছর রাজত্ব করার পর নিউটনের বলবিদ্যার সীমাবদ্ধতা প্রমাণ করেন বিশ শতকের প্রথমেই আলবার্ট আইনস্টাইন। নতুন এক বিশ্বছবির জন্ম দেন তিনি। বিশ শতকের প্রথম ত্রিশ বছরে পদার্থবিজ্ঞানে যে বিপ্লব ঘটে তা এতদিনে 'normal' বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। আইনস্টাইনের বিশ্বছবি প্রমাণ করে যে বিজ্ঞানে শেষ বলে কিছু নাই। যা আছে তাহল আপেক্ষিকতা।

তাই আইনস্টাইনের বড় ভক্ত ও বড় সমালোচক কার্ল পপার বিশ শতকের মাঝামাঝি আর এক নতুন বিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে হাজির হন। তিনি বেকনের আরোহী পদ্ধতিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে অধিবিদ্যা ও অপবিজ্ঞানের পার্থক্য করার জন্য 'খন্ডনযোগ্যতা' (Falsibiality) নামে একটি ইন্টারেস্টিং বিজ্ঞানের দর্শনের জন্ম দেন।

৮.

মধ্যযুগের শুরুতে সেন্ট অগাস্টিনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ না হলেও শেষপাদে সেন্ট টমাস এ্যকুইনাসের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি বিজ্ঞানের অগ্রগতি স্তব্ধ করতে পারেননি ঠিকই কিন্তু গতি কিছুটা হলেও শ্লথ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। একদিকে পুঁজিবাদ ও মধ্যপন্থী বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্থান, অন্যদিকে একের পর এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার; সেইসঙ্গে মার্টিন লুথারের ধর্ম সংস্কার আন্দোলন। এই তিনের আক্রমণে ইউরোপের সমাজ ক্ষতবিক্ষত। ব্রুনোকে হত্যা করে, গ্যালিলিওকে সারাজীবন কারাদন্ড দিয়েও বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ঠেকানো যায়নি।

আমরা দেখেছি শুরুতে বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির এক অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। কিন্তু বিজ্ঞান যত শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে, বিশ্বাস ও যুক্তি তাদের বিরোধ মিটিয়ে একত্রে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। তাদের সে মিলিত শক্তি বিজ্ঞানীদের ওপর কেবল অত্যাচারই করেনি, তারা নানা তত্ত্বের অবতারণা করে বিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষের মনে ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করতে সচেষ্ট হয়। বিজ্ঞানের পথ কন্টকাকীর্ণ করে তোলার চেষ্টা করে। ফলে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা সাময়িক হলেও কখনও কখনও মন্থর হয়ে গেছে। কখনও মনে হয়েছে বিজ্ঞানের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। কারণ বিজ্ঞানের মৃত্যু মানেই মানুষের মৃত্যু। বরং ধর্ম ও দর্শনের সে মিলিত শক্তি ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞানের কাছে হার মানে। বিজ্ঞানের শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দির পর বিজ্ঞানকে আর পিছন দিকে তাকাতে হয়নি। প্রমাণ হয়েছে অভিজ্ঞতানির্ভর প্রাযুক্তিক ও যুক্তিবাদী বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা অপ্রতিরোধ্য। ধর্মীয় বিশ্বাস ও ভাববাদী দর্শনের সামনে আজ সে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। পুঁজিবাদের উত্থান, কপারনিকাসের আবিষ্কার, মার্টিন লুথারের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন ও আধুনিক বিজ্ঞানের 'প্রফেট' ফ্রান্সিস বেকনের আরোহী পদ্ধতি আধুনিক সভ্যতার দ্বারোদঘাটন করে। মানুষ নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিনের ধর্মীয় ও ভাববাদী দর্শনের দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে মানুষ ক্রমশঃ আত্মবিশ্বসী হয়ে ওঠে। মুক্তবুদ্ধির অবদমন, চিন্তার দাসত্বের বিরুদ্ধে আধুনিক বিজ্ঞান হয়ে ওঠে এক শক্তিশালী হাতিয়ার। সর্বজনীন শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়, খাদ্য-স্বাস্থ্য-বাসস্থান মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। মানুষ তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে ভাস্বর হয়ে ওঠে। ধর্ম ও ভাববাদী দর্শনের শৃঙ্খল-মোচন করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে আধুনিক বিজ্ঞান। বিজ্ঞান আজ এক স্বাধীন, সার্বভৌম সত্তায় পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞানের সে জগৎ আজ লক্ষ-কোটি মানুষের কর্মসংস্থান করছে। বিজ্ঞানের সামনে আজ আর কোন প্রতিপক্ষই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

ওদিকে যে লুথার ক্যাথলিক ধর্মের প্রতিক্রিয়ার দুর্গে আঘাত করে আপেক্ষিক প্রগতিশীল প্রটেস্টান্ট ধর্ম প্রবর্তন করেন, তিনিই আবার কপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। ১৫৪৬ সালে মৃত্যুর আগে তিনি কপারনিকাসকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন। প্রটেস্টান্টরা হত্যা করে সার্ভেটাসকে আর ব্রুনোকে হত্যা করে ক্যাথলিকবৃন্দ। প্রমাণ হয় ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পরস্পর শত্রু হলেও বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে তারা উভয়েই ছিল খড়গহস্ত। অতঃপর নানা নিপীড়ন ও অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়েও আধুনিক বিজ্ঞান কেপলার, ব্রাহে, গ্যালিলিও-র হাত ধরে নিউটনে এস শিখর স্পর্শ করে। বিজ্ঞানের জগৎ আজ স্বমহিমায় উজ্জ্বল। বিজ্ঞানই আজকের পৃথিবী। তাই আজ নানা ধর্ম ও নানাবিধ বস্তুবিধ্বংসী-ভাববাদী দর্শন বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এখন তারা পরস্পরের শত্রু নয় – পরিপূরক। কারণ আজকের পুঁজিবাদী বিশ্বে তাদের স্বার্থ অভিন্ন।

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা' শীর্ষক আলোচনার পূর্বে সামান্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটির প্রয়োজন ছিল। আমি এখানে নিজের কথা বলিনি। বলার যোগ্যতাও আমার নাই। এসব বিষয়ে যাঁরা গভীর গবেষণা করেছেন, তাদের বই পড়ে, তাদেরই কথা বলেছি। এই অংশটি শেষ করে এনেছি। ইউরোপে বিজ্ঞানের উত্থানের কারণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,

"ধর্মশাস্ত্রের প্রতি সেখানকার মনুষত্বের ঐকান্তিক যে নির্ভর ছিল, সেটা ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে এল। একদিন সেখানে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রের প্রায় সমস্তটাই ধর্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অন্তর্গত না হোক, অন্তত শাসনগত ছিল। লড়াই করতে করতে অবশেষে সেই অধিকারের কর্তৃত্বভার তার হাত থেকে স্খলিত হয়েছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে যেখানে শাস্ত্রবাক্যের বিরোধ, সেখানে শাস্ত্র আজ পরাভূত; বিজ্ঞান আজ আপন স্বতন্ত্র বেদীতে একেশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত। ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি মানুষের অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয় বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতির অনুগত হয়ে ধর্মশাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞাতব্য ও মন্তব্য বিষয়ে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রবণতা আজ বৈজ্ঞানিক। অপ্তবাক্যের মোহ তার কেটে গেছে।"[১০]

বিংশ শতাব্দীর একজন প্রথম সারির শিক্ষার দার্শনিক Stella Van Petten Henderson-এর মুখেও একই কথা শুনি,

"While Science was growing in the estimation of man, philosophy and even religion were losing its prestige."[১১]

আধুনিক বিশ্বে ধর্মের অবস্থানের ওপর এক বিশাল গবেষণা করেছেন Steve Bruce. সে বই এর তৃতীয় অনুচ্ছেদের শিরোনাম হল 'The Erosion of the Supernatural'. তিনি বলছেন, "the modern urban industrial society of Western Europe, North America and Australia are considerably less religious than the formations that preceded them."[১২]

বিজ্ঞান যখন বিশ্বব্রহ্মান্ডে মানুষের উদ্ভব ও ভূমিকা বিষয়ক আলোচনায় নিমগ্ন হয়, তখন ধর্ম ও দর্শন তাদের পূর্বের গুরুত্ব হারায়। একথা যেমন সঠিক, তেমনি একথাও সঠিক যে ধর্ম ও দর্শন তাদের জমি কখনই বিজ্ঞানের কাছে পুরোপুরি ছেড়ে দেয়নি। তাই আজকের এই বৈজ্ঞানিক পৃথিবীতে চরম অবৈজ্ঞানিক ধর্ম ও দর্শন তার হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পেতে চাইছে। আর সে চাওয়ার পিছনে বড় শক্তি হিসেবে কাজ করছে মরচে ধরা প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া-পৃথিবীর মোড়ল উন্নত বিশ্ব। তাই বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনের ঐতিহাসিক লড়াই আজও তার যৌক্তিক পরিনতিতে পৌছেনি। পৌছাতে পারছে না।

এ পর্যন্ত বিজ্ঞানের সার্বভৌম সাম্রাজ্য বিস্তারে ও প্রতিষ্ঠানে যে'কটি নাম স্মরণীয় তাঁরা হলেন উষালগ্নে থেলিস ও ডেমোক্রিটাস, মধ্যযুগে কপারনিকাস, আধুনিক যুগে গ্যালিলিও, নিউটন, বেকন, ডারউইন ও আইনস্টাইন। থেলিস ও ডেমোক্রিটাস বিজ্ঞানের লাট্টুটা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন – ধর্মীয় বিশ্বছবির মধ্যে বাস করে বস্তুবাদী দর্শনের জন্ম দেন। ধর্মীয়-ভাববাদী বিশ্বছবির মধ্যে বাস করে যাজক

কপারনিকাস ধর্মীয় ও ভাববাদী দর্শনের কফিনে প্রথম পেরেকটি ঠোকেন। আর বেকন-গ্যালিলিও-নিউটন-ডারউইন-আইনস্টাইনদের হাত ধরে বিজ্ঞান আজ সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত বস্তুবাদী দর্শনের এক বৈজ্ঞানিক বিশ্বছবি উপহার দিয়েছেন। তাই এই সূচনা বক্তব্য বোধহয় এভাবে শেষ করা যায় যে অতিতে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার্থে ধর্ম ও দর্শন এক ধনাত্মক ভূমিকা পালন করেছিল, সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন থাকার অবকাশ নাই। সে স্থানটি আজ বিজ্ঞানের দখলে। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের পর মানুষের বস্তুজ্ঞান ক্রমশ এমন এক স্তরে পৌছেছে, যার কোন ব্যাখ্যা করা ধর্ম ও ভাববাদী দর্শনের পক্ষে সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের কোন শাখায় উচ্চতর জ্ঞানার্জন ছাড়া ধর্ম ও ভাববাদী দর্শনের পক্ষে আজকের বস্তুজ্ঞানের ত্রিসীমানায় পৌছানো সম্ভব নয়। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা আমাদের এই শিক্ষা দেয়।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা

১.

বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্কতার পার্থক্য আকাশ-পাতাল। বিজ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক কিন্তু বিজ্ঞানমনস্কতা প্রচন্ডভাবে ব্যক্তিক। বস্তুকে নিয়েই বিজ্ঞানের কারবার। বস্তুর কোন ধর্ম নাই, বর্ণ নাই, জাত-পাত-লিঙ্গ-ভাষা-সংস্কৃতি নাই। তাই বিজ্ঞানেরও কোন ধর্ম নাই, বর্ণ নাই, জাত-পাত-লিঙ্গ-ভাষা-সংস্কৃতি নাই। বিজ্ঞান বস্তুকে কেবল বস্তু হিসেবেই দেখে। তার অভ্যন্তরীণ সংগঠন আবিষ্কারে যত্নবান হয়। প্রকৃতি ও বিশ্বব্রহ্মান্ডের অন্তর্নিহিত নিয়মাবলী খুঁজে বার করতে চায় – তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি তা নির্ণয় করতে চায়। আর মানুষ হল বিজ্ঞানের কারবারি। মানুষের ধর্ম আছে, বর্ণ আছে, জাত-পাত-লিঙ্গ-ভাষা-সংস্কৃতি আছে। এসব নিয়ে মানুষ গর্ব অনুভব করে। মানুষ সচরাচর এইসব গুণাবলী বা বৈশিষ্টের উর্ধে উঠতে পারে না। এইসব গুণাবলী বা বৈশিষ্ট নিয়েই মানুষ বিজ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত হয়। বস্তু মানব নিরপেক্ষ। একজন বহিরাগতের মত মানুষ সেই বস্তুচর্চায় নিয়োজিত হয়। সেই তৎপরতার নামই বিজ্ঞান। কিন্তু বিজ্ঞান-চর্চা বা বস্তু-চর্চায় নিয়োজিত হবার সময় মানুষ সচরাচর তার নিজস্ব গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের প্রতি অনুগত থাকে। থাকতে ভালবাসে। কিন্তু এতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলে কোন পার্থক্য সূচিত হয়না। যেমন ধরুন, একজন মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান, ইহুদী কিংবা বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বসী মানুষ যদি একটি মৌলিক কণিকা আবিষ্কার করেন, তাহলে ঐ মৌলিক কণিকাটি আবিষ্কারকের ধর্ম গ্রহণ করে না। কিন্তু আমরা মানুষ জন্মসূত্রে একটি ধর্ম লাভ করি। আমরা বলতে পারি না যে ঐ মৌলিক কণিকাটি মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, ইহুদী বা বৌদ্ধ। একজন একশভাগ মুসলিম আব্দুস সালাম ও একজন একশ ভাগ নাস্তিক স্টিভেন ওয়াইনবার্গ একত্রে ১৯৭৯ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন একই আবিষ্কারের জন্য। এ সম্পর্কে সালাম বলেন,

“it made no basic difference to our work whether I was an ‘avowed believer’ and Weinberg an ‘avowed atheist’. We were both ‘geographically and ideologically’ remote from each other. When we conceived the same theory of physics of unifying the weak and the electromagnetic forces.”[১]

তাই তিনি কোন ধর্মীয় আদর্শায়িত বা সাম্প্রদায়িক বিজ্ঞানে বিশ্বাস করেন না। সাম্প্রদায়িক বিজ্ঞানের ধারণা গুঁড়িয়ে দিয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন,

“There is only one universal science; its problems and modalities are international and there is no such science as Islamic science just as there is no Hindu science, no Jewish science, no Confucian science, no Christian science.”[২]

এই কথাটিই আরো জোরের সঙ্গে বলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন,

"Scientific results are entirely independent from religion or moral consideration. Those individuals to whom we owe the great creative achievements of science were all of them imbued with the truly religious conviction that this universe of ours is something perfect and susceptible to the rational striving for knowledge."[৩]

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তব্যের কথা মনে পড়ল। ১৩২৬ সালে তিনি লিখেছিলেন, "যুক্তির নিয়ম সকল দেশেই সমান, যে-সকল পদার্থ প্রমাণের বিষয় তাহাদিগকে প্রমাণ করিবার প্রণালী সর্বত্র এক। ভারতবর্ষের ইতিহাসের তথ্যবিচার এক নিয়মে হইবে আর ইংলন্ডের অন্য নিয়মে হইবে ইহা হইতেই পারে না, বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও তাহার ফল দেশভেদে বিভিন্ন হইবে ইহাও অসম্ভব। অতএব বুদ্ধিবৃত্তিমূলক যে শিক্ষা য়ুরোপ পৃথিবীকে দিতেছে তাহা সর্বত্র এক হইবেই।"[৪]

বিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কারের জন্য আজ যাঁরা স্মরণীয় ও বরণীয় তাঁরা প্রায় সবাই কোন না কোন ধর্মে বিশ্বাস করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মান্ড নিখুঁত এবং যেকোন যুক্তিবাদ বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বিশ্বব্রহ্মান্ড সম্পর্কে এ সত্যে ফাটল ধরাতে পারে। তাই বিজ্ঞানের সূচনালগ্ন থেকেই ধর্ম ও ভাববাদী দর্শন প্রকৃতি নিয়ে গবেষণাকে সুনজরে দেখেনি। কারণ প্রকৃতির গূঢ় রহস্য আবিষ্কৃত হলে ধর্ম ও ভাববাদী দর্শনের অনেক গোমড় ফাঁস হয়ে যাবে। তাই প্লেটো-এরিস্টটল প্রাক-সক্রেটিক প্রকৃতি-দার্শনিকদের আক্রমন করেছিলেন। মানুষের বস্তুজ্ঞান যত নিম্ন পর্যায়ে থাকবে ধর্ম ও ভাববাদী দর্শনের প্রভাব ততই বাড়ে। কথাটি যে সত্য, তা কি প্রমাণ হয়নি? গ্যলিলিওর ওপর যে অবিচার করেছিল তখনকার পোপ, তার জন্য বিংশ শতাব্দীতে এসে পোপ ক্ষমা প্রার্থনা করেনি? ব্রুনোর বইগুলোর ওপর পোপ যে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন, তা আজও প্রত্যাহার করা হয়নি।

সেই স্মরণীয় ও বরণীয়দের কোন ধর্মে বিশ্বাসী হবার কারণে তাঁদের আবিষ্কার ব্যর্থ হয়ে যায়নি। সবাই তো আইনস্টাইনের মত ত্যাদড় ছেলে নয়। ইহুদী মা-বাবার সন্তান হয়েও যিনি মাত্র ১২ বছর বয়সে ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারান এবং বলেন যে বাইবেলে বর্ণিত সব গল্পই সত্য নয়। মধ্যযুগে বা আধুনিক যুগের সূচনালগ্নেও তিনি যদি একথা বলতেন, তাহলে নির্ঘাত তাঁকে বিচারের সম্মুখীন হতে হত। আইনস্টাইন আস্তিক ছিলেন না নাস্তিক ছিলেন পাঠকই তার বিচার করবেন। বাইবেলের সব গল্প যে সত্যি নয়, তিনি শুধু একথা বলেই ক্ষান্ত হননি। আরো বলেছেন, "বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কোন অতিপ্রাকৃত শক্তি বা ঈশ্বরের কোন ভূমিকা নাই।" তিনি আত্মার কোন স্বাধীন সত্তায় বিশ্বাস করতেন না। বিশ্বাস করতেন না মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে। পুরস্কার হিসেবে স্বর্গ এবং শাস্তিস্বরূপ নরকেও বিশ্বাস করতেন না। তাঁকে কি বিশ্বসী বলা যায়? যাক বা না-যাক, তাতে কিছুই যায়-আসে না। তিনি আস্তিক হন কিংবা নাস্তিক, তিনি যা আবিষ্কার করে গেছেন তা বিংশ শতাব্দীতে এক নতুন বিশ্বছবির জন্ম দিয়ে গেছে, যা আজও তেমন কোনো প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হয়নি। আপেক্ষিক তত্ত্ব বা $E=mc^2$ আজও সত্য। তিনি যা আবিষ্কার করে গেছেন তা আইনস্টাইন নিরপেক্ষ। আইনস্টাইনের ধর্ম ও নৈতিকতা যাই হোক না কেন, তাঁর আবিষ্কার মানুষের চিন্তার জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। সে আবিষ্কার তার বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিরপেক্ষ। তাঁর বিশ্বাস যাই হোক না কেন, তাঁর আবিষ্কারের আগে কোন সাম্প্রদায়িক বিশেষণ জুড়ে দেয়া যাবে না।

২.

এবার আমরা আর একজনের কথা বলি, যিনি মধ্যযুগীয় ধর্মীয়-এরিস্টটলীয়-টলেমীয় বিশ্বব্রহ্মান্ডের কাফনে প্রথম পেরেক ঠুকেছিলেন। সূচনাবক্তব্যে তাঁর কথা এসেছে। তিনি কিন্তু একজন সাচ্চা ক্যাথলিক-ধর্ম যাজক। কাজেই তাঁর ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলা

যাবেনা। তিনি হলেন কপারনিকাস। ভয়ে ভয়ে তিনি সত্য প্রকাশ করে গেছেন, তা কি মিথ্যা হয়ে গেছে? ধর্মগ্রন্থ বলছে, সেরা দার্শনিক ও বিজ্ঞানী এরিস্টটল বলছেন, টলেমী বলছেন, পৃথিবীই সৌরজগতের কেন্দ্র। সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। তাঁদের কথা অবিশ্বাস করার ক্ষমতা কার আছে? পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ হাজার বছর ধরে তা বিশ্বাস করে এসেছে। পৃথিবীর সব মানুষ হাজার হাজার বছর যা বিশ্বাস করে আসে, তাই যে সত্য হয়ে যায় না, কপারনিকাস সেটাই প্রমাণ করলেন। বিজ্ঞানের সত্যাসত্য নির্ণয়ে গণতন্ত্র খাটে না। একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সত্য না মিথ্যা, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভোটে তা নির্ণীত হয় না। কপারনিকাস মরে বেঁচেছিলেন। তাঁর সত্যটি মেনে এবং প্রচার করতে গিয়ে জিওর্দানো ব্রুনোকে সর্বশক্তিমান পোপের সামনে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। বিচারে তাঁর মৃত্যুদন্ড হয়েছিল। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে খোলা আকাশের নিচে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। কপারনিকাসের আবিষ্কারকে আজও কেউ ভ্রান্ত প্রমাণ করতে পারেনি। বরং বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এ সত্যকে আরো জাজ্বল্যমান করে তুলেছে। এভাবে বিজ্ঞানের সত্য প্রমাণ করতে গিয়ে গ্যালিলিওকে অত্যাচারিত হতে হয়েছিল। পৃথিবীর অপর গোলার্ধে দেশ আছে, মানুষ আছে, এ সত্য উচ্চারণ করে পোপের বিচারে প্রাণ দিয়েছিলেন সেকো দাস্কোলিকে। কারন পৃথিবী যে গোল এবং অপর গোলার্ধে যে মানুষ থাকতে পারে, এরকম বিশ্বাস ছিল ধর্ম বিরোধী। পৃথিবীর অপর পিঠে যে দেশ আছে, সেখানে মানুষ আছে, আছে প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার, একথা বোঝাতে কলম্বাস দশ বছর পর্তুগাল, স্পেন, ইংলন্ড ও ফ্রান্সের রাজ-দরবারে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বিশেষজ্ঞগণ তাঁর প্রস্তাব নাকচ করে দেন। শেষে স্পেনের রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রানী ইসাবেলা তাঁর যুক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং সব রকমের সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৪১২ সালে কলম্বাস আমেরিকায় গিয়ে পৌছান। ইউরোপের মানুষের কাছে তার আগে আমেরিকা, সেদেশের মানুষ ও সম্পদ অজানা ছিল। ধর্মযাজক ও ভাববাদী পন্ডিতদের অজ্ঞানতার জন্য দাস্কোলিকে জীবন দিতে হয়েছিল।

৩.

এটা প্রমাণ হল আশা করি যে ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাস বিজ্ঞান গবেষণার ফলাফলের ওপর কোন প্রভাব ফেলে না। বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তা কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে বস্তু মানব নিরপেক্ষ। এই বিশ্বাস বিজ্ঞানমনস্কতার একটি প্রধান স্তম্ভ। মাত্র সেদিন ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে সেসময়ের প্রখ্যাত পদার্থবিদ আর্নেস্ট মাখের ‘Mechanics’ বইখানি প্রকাশিত হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলতে তিনি কি বুঝতেন তা স্পষ্ট ভাষায় সে বইতে লিখেছেন, “All natural science can only picture and represent complexes of those elements which are ordinarily call sensation.”[৫] বিজ্ঞানের দর্শনের জগতে মাখ ছিলেন একজন বিখ্যাত দৃষ্টবাদী-positivist. তবে পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে তিনি যে কাজটি করেছিলেন তাহল তিনি নিউটনের দু’শ বছরের পুরনো বলবিদ্যার ত্রুটিগুলো শনাক্ত করেছিলেন। আইনস্টাইনকে তা দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং তিনি জীবনের ৪২টি বছর মাখের দৃষ্টবাদী দর্শনের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন ছিলেন। মাখের বস্তু বিধ্বংসী দৃষ্টবাদ থেকে নিস্কৃতি পেতে তাকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

কিন্তু ১৯০৮ সালে ভি. আই. লেনিন মাখের সেই দৃষ্টবাদী দর্শন কতটা বিজ্ঞান বিরোধী ও ভাববাদী তা প্রমাণ করেন তার বিশ্বখ্যাত ‘Materialism and Empirio-Criticism’ বইতে।[৬] তিনি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, “Did Nature Exist Prior To Man?” সূচনা বক্তব্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের সেই প্রবীণ অধ্যাপকের কথা স্মরণ করুন। লেনিন লিখেছিলেন, “Natural Science positively asserts that the earth once existed in such a state that no man or any other creature existed or could have existed on it. Organic matter is a later phenomenon, the fruit of long evolution.”[৭] কট্টর মার্ক্সবাদ বিরোধী বিংশ শতাব্দীর

অন্যতম প্রধান বিজ্ঞানের দার্শনিক কার্ল পপারের মুখেই এর উত্তরটা শোনা যাক। তিনি ১৯৮২-৮৩ সালে প্রকাশিত 'Quantum Theory and the Schism in Physics' বই এর ভূমিকায় লিখছেন, "যে ভৌত-বিশ্বে আমরা বাস করি তার বাস্তবিকতা – আমাদের অস্তিত্ব ছাড়াও এটি বিশ্বের অস্তিত্ব আছে এইমর্মে বাস্তবতা; আমাদের প্রকৃষ্টতম অনুকল্প অনুসারে আমরা যতদূর জানি – জীবনের অস্তিত্বের পূর্বেই বিশ্বের অস্তিত্ব ছিল, আমাদের সবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পরও, এবং অব্যাহতভাবেই, এর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে – এইমর্মে বাস্তবতা।"[৮] ১৯৭৭ সালে স্টিভেন ওয়াইনবার্গ বিষয়টি আরো সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছিলেন। তিনি বলছেন যখন 'বিগ-ব্যাং' বিস্ফরণ ঘটে, তার ১/১০০ সেকেন্ডের মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা ছিল একশ হাজার মিলিয়ন ($১০^{১১}$) ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। সেই তাপমাত্রায় আমাদের চেনা বস্তু জগতের কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব ছিল না। সেই তাপমাত্রায় কেবল ইলেকট্রন, পজিট্রন, নিউট্রিনোস ও ফোটন অর্থাৎ আলোর অস্তিত্ব ছিল।[৯] তিনি আরো লিখছেন, "Much later, after a few hundred thousand years, it would become cool enough for electrons to join with nuclei to form atoms of hydrogen and helium."[১০] আধুনিক বিজ্ঞানের 'পয়গম্বর' বেকন দৃষ্টবাদী। মাখও দৃষ্টিবাদী। মাখের দৃষ্টবাদ যদি বস্তুবিধ্বংসী এবং ভাববাদী হয়, তাহলে বেকনের দৃষ্টবাদ নয় কেন? আসলে আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় বিজয়ের প্রতি যদি আমাদের আস্থা থাকে তাহলে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। জর্জ সার্টন বলেছেন, "জ্ঞানের আপেক্ষিকতার ধারণার প্রতি মানুষের বিশ্বাস স্থাপনই হল বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় বিজয়।"[১১] তাহলে বোঝা যায় মাখের দৃষ্টবাদ কেন অবৈজ্ঞানিক আর সপ্তদশ শতাব্দীর বেকনের দৃষ্টবাদ কেন বিজ্ঞানের বন্ধ দরজা খুলে দিল। বেকনের সময় বিজ্ঞানের দরজা রুদ্ধ করা হয়েছিল। ধর্মীয় ও এরিস্টলীয় বিজ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত 'স্কলাসটিসিজম' বিজ্ঞানের অগ্রসর হওয়ার সব পথ বন্ধ করে রেখেছিল। বেকনের দৃষ্টবাদ ও আরোহী পদ্ধতি সে দরজা খুলে বিজ্ঞানকে এগিয়ে যাবার পথ করে দিয়েছিল। আপনারা পুঁজিবাদের কথাই ধরতে পারেন। সূচনালগ্নে পুঁজিবাদ ছিল একটি প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামো। সামন্ততন্ত্রের অমানবিকতা ধ্বংস করে পৃথিবীতে এক নতুন বিশ্বছবি স্থাপন করেছিল। কালের গতিতে আজ তা প্রতিক্রিয়ার দূর্গে পরিণত হয়েছে।

৪.

এবারে আমরা বিজ্ঞানমনস্কতার দিকে দৃষ্টি দেব। বিজ্ঞানমনস্কতার সংজ্ঞা নির্ণয় খুবই জটিল বিষয়। আমি নিজে বিষয়টি যেভাবে বুঝি, ঠিক সেভাবে ভাষায় প্রকাশ আমার কাছে অসম্ভব মনে হয়। এটা ভাষার সীমাবদ্ধতা, নাকি আমার সীমাবদ্ধতা, আমি ঠিক বুঝতে পারি না। বিজ্ঞানমনস্কতা মনের বিষয় – মানুষের বিশ্বাস অবিশ্বাসের ব্যাপার। তাই বিজ্ঞানমনস্কতা বলতে এক একজন এক একরকম বুঝবে, এটাই স্বাভাবিক। মনের সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক নিয়েই যত ঝঞ্ঝাট। জ্ঞানতত্ত্বের শুরু থেকে পন্ডিত, দার্শনিকগণ এ নিয়ে ভাবছেন। বিভিন্ন তত্ত্ব নির্মাণ করছেন। বিজ্ঞানমনস্কতার প্রশ্নটি তাই জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভবে যুক্ত। জ্ঞানের উৎস কি? এটি দর্শনের মৌলিক প্রশ্ন। মানুষ কি জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে? প্লেটো (৪২৮/৪২৭-৩৪৭ খ্রিঃ পূঃ) তাই মনে করতেন। নাকি জন্মের পর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করে? অভিজ্ঞতাবাদের প্রধান বক্তা জন লক (১৬৩২-১৭০৪ খ্রিঃ) তাই মনে করতেন। আবারও বলি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে দার্শনিকরা দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ভাববাদী ও বস্তুবাদী। বিজ্ঞান যেহেতু বস্তুবাদী তাই আমরা অনায়াসে ভাববাদী জ্ঞানতত্ত্বকে আমাদের হিসেবের বাইরে রাখতে পারি। বস্তুবাদের মধ্যেই আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখবো।

৫.

পৃথিবীর সমাজ-সভ্যতা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধর্ম-দর্শন সবই ক্রমবিকাশের অধীন-আপেক্ষিক। বিংশ শতাব্দীর আগে একথা আমরা উচ্চারণ করতে পারতাম না। আমার এ বক্তব্য বিংশ শতাব্দীর নতুন প্যারডাইমের ফসল। বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানে মহাবিপ্লবের ফলে আমাদের দৃষ্টি আজ পরমাণুর অভ্যন্তরের জটিল গঠন প্রণালী উন্মোচন করেছে। উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের RNA-DNAতে গিয়ে ঠেকেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বৃহৎ পরিসরে আমাদের দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে লিউসিপ্পাস ও ডেমোক্রিটাস এটমের প্রস্তাব করলেও ১৯০৫ সালের আগে তা আবিষ্কার হয়নি। তাই আজকের বিজ্ঞানমনস্কতা পরমাণু ঘিরেই আবর্তিত হয়। তেমনি ১৮৫৯ সালে ডারউইনের 'Origin of Species' বইটি প্রকাশের পর বিজ্ঞানমনস্কতার জগতে এক বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়, যেমন হয়েছিল কপারনিকাসের পর।

তেমনি ১৯৫৭ সালে মহাকাশ বিজয়ের লক্ষ্যে উৎক্ষেপিত প্রথম স্পুটনিক আমাদের চিন্তার জগতে আর এক বিপ্লব সাধন করে। তাই মানুষের বিশ্বাস-নিরপেক্ষ বিজ্ঞানচর্চার ফলাফল বিজ্ঞানমনস্কতার ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রভাব রাখে। বিজ্ঞান চর্চা বিজ্ঞানীর বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিরপেক্ষ হলেও, তার আবিষ্কারগুলি বিজ্ঞানমনস্কতার সীমানা নির্ধারক। সাধারণত যেসব বিশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপন করলে কিংবা যেসব বিশ্বাসে অবিশ্বাস স্থাপন করলে একজনকে বিজ্ঞানমনস্ক বলা যায়, সেসব বিশ্বাস-অবিশ্বাসগুলি কিন্তু পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনে বিশ্বাস স্থাপন করা বিজ্ঞানমনস্কতার একটি প্রধান লক্ষণ।

বিগত আড়াই হাজার বছরের বিজ্ঞানের ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা পিছনে রেখে আজ যেসব বিশ্বাস-অবিশ্বস আমাদের কাছে শাশ্বত মনে হয়, প্রাচীন ও মধ্যযুগে একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কাছে তা আশা করা ইতিহাস সম্মত নয়। তবুও সেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে যারা প্রকৃতিবাদী বা বস্তুবাদী বলে প্রতিপক্ষ সমাজপতিদের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন, তাঁরাই ছিলেন সে সময়ের বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি। সেযুগে তাঁরাই ছিলেন প্রগতিবাদী। এ্যানাক্সোগোরাসের (৫০০-৪২৮ খ্রিঃ পূঃ) বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহীতার অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছিল। এথেন্স থেকে তিনি পালিয়ে বাঁচেন।[১২] তাঁদের বিজ্ঞানমস্কতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা গেলেও একথা তো মিথ্যা নয় যে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী দর্শনের ক্রমবিকাশের মহাসড়কে তাঁরা চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন। থেলিস, এ্যানাক্সিমেন্ডার, এ্যানাক্সিমিনস, এ্যানাক্সেগোরাস, জেনোফেন প্রমুখ যাঁদের হাতে গ্রিক দর্শন ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়েছিল, তারা সবাই ছিলেন বস্তুবাদী। তখনকার ধর্মীয় বিশ্বছবির মধ্যে বাস করেও তাঁরা ইহজাগতিক ঘটনাবলীর মধ্যেই ইহজাগতিক/প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন অনুসন্ধানে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন, এটা কম বড় কথা নয়। পরবর্তী গ্রিক দার্শনিকদের অনেকেই এঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে মহাজ্ঞানী প্লেটো এরিস্টটল দু'জনই আছেন। প্লেটো প্রকৃতিবাদী বিশেষ করে ডেমোক্রিটাসের সমস্ত লেখা পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন।

৬.

সমাজ পরিবর্তনের সেই যুগসন্ধিক্ষণে যখন পারিবারিক 'ক্রীতদাসপ্রথা' একটি সুনির্দিষ্ট মূল অর্থনৈতিক কাঠামোয় রূপান্তরিত হচ্ছে, সেই সময় ধর্মের সাথে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সংঘর্ষ তুঙ্গে ওঠে। জয় হয় ক্রীতদাসপ্রথার পক্ষের দার্শনিকগণের, প্লেটো, এরিস্টটল প্রমুখের। কিন্তু সে সংঘর্ষ থেমে যায়নি। পরে এপিকিউরাস, লুক্রেশিয়াস প্রমুখ প্রকৃতি বিজ্ঞানী ধর্মীয় দর্শনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান। আবার ক্রীতদাস অর্থনীতির ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যখন সামন্তবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্ম হচ্ছে তখনও সমগ্র পৃথিবী সংঘর্ষময় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে সংঘর্ষ মূলত ধর্মের সাথে ধর্মের এবং যুক্তির সাথে বিশ্বাসের। সামন্তবাদী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট হল এই

যে, তা অনেকটা বন্ধ্যা। তখন জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার তেমন একটা প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু তের/চোদ্দ শতকে পুঁজিবাদের আগমন বার্তা আর একটি নতুন প্যারাডাইমের জন্ম দেয়; এক নতুন সংঘর্ষের পূর্ব লক্ষণ। প্রগতিশীল ও অগ্রসরমান পুঁজিবাদ সামন্তবাদকে ধ্বংস করার সাথে সাথে বিজ্ঞানের রুদ্ধ দরজা উন্মোচন করে। এবারে সংঘর্ষ বাধে ধর্ম ও ভাববাদী দর্শনের সঙ্গে বস্তুবাদী দর্শন ও তার সর্বোচ্চ রূপ বিজ্ঞানের। সে সংঘর্ষে অশেষ অত্যাচার-নির্যাতনের শেষে বিজ্ঞানেরই জয় হয়। কিন্তু তার আগের দীর্ঘ প্রায় এক হাজার বছরের সামন্তবাদী সংস্কৃতিতে অভিসিক্ত মনে বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সহজে প্রবেশ করতে চায় না। কিন্তু বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব বিজয়রথ এগিয়ে চলে। নতুন নতুন আবিষ্কারে পুরনো পৃথিবীর আদল পাল্টে যায়। মানুষের মনে তা নানা ধরেনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঝড় তোলে একথা ঠিক কিন্তু মানুষের মনটি বিজ্ঞানমনস্কতার জারক রসে ভিজতে অনেক সময় লেগেছে। এমন কি আজও একশ ভাগ বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

আবারও রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হই। ১৩২৮ সালে লেখা তাঁর 'শিক্ষার মেলা' প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, "পূর্বদেশে আমরা যে সময়ে রোগ হলে ভূতের ওঝা ডাকছি, দৈন্য হলে গ্রহশান্তির জন্য দৈবজ্ঞের দ্বারে দৌড়ছি, বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখবার ভার দিচ্ছি শীতলাদেবীর 'পরে, আর শত্রুকে মারবার জন্যে মরণ উচাটন মন্ত্র আওরাতে বসেছি, ঠিক সেই সময় পশ্চিম মহাদেশে ভলটেয়ারকে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'শুনেছি নাকি মন্ত্রগুণে পালকে পাল ভেড়া মেরে দেয়া যায়, সে কি সত্যি?' ভলটেয়ার জবাব দিয়েছিলেন, 'নিশ্চয়ই মেরে ফেলা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেঁকো বিষ থাকা চাই।' য়ুরোপের কোনো কোণে-কানাচে জাদুমন্ত্রের পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে সেঁকো বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ববাদিসম্মত।"[১৩] আইনস্টাইনের কথায় 'scientific results' যদি সত্যিই 'entirely independent' হয় 'from religious or moral consideration', তাহলে আমাদের দেশের একজন সফল ডাক্তার একটি অপারেশন করার আগে যে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়েন, তার কোন প্রভাব কি অপারেশনের ওপর পড়ে? অপারেশনের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা কোনমতেই কি নামাজ পড়ার ওপর চাপানো যাবে?

ফ্রান্সিস বেকন 'নোভাম অর্গানম'-এর ৩৮ সিদ্ধান্তে বলছেন "ইতিমধ্যে যে সব বিশ্বাস ও মিথ্যা ধারণা মানুষের উপলব্ধির জায়গাগুলি দখল করেছে এবং মনের মধ্যে দৃঢ় আসন গেড়েছে, মানুষের মনে সত্য প্রবেশের পথে সেগুলো কেবল মহা অন্তরায় হয়ে রয়েছে তাই নয়, সত্য প্রবেশ করলেও বিজ্ঞানের সাথে তা মিশে যেতে পারে না।"[১৪] বেকন এরকম চারটি 'Idol' বা বিশ্বাস চিহ্নিত করেছিলেন। ৪৬ সিদ্ধান্তে তিনি একটি গল্প বলেন। সেই গল্পের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতার একটি সংজ্ঞা দাঁড় করানো যায়। গল্পটি এরকম। 'জাহাজ ডুবির পর কিছু যাত্রী নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল এবং ঈশ্বরের কাছে শপথের তাদের একটি অঙ্কিত চিত্র মন্দিরের দেয়ালে টাঙ্গানো ছিল। সেই ছবিটিকে দেখিয়ে জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হল যে এরপরও কি ঈশ্বরের ক্ষমতা সম্পর্কে তার কোন সন্দেহ আছে? লোকটি উত্তরে চমৎকার জবাব দিয়েছিলেন! বলেছিলেন, "ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার পরও যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের ছবি কই?"[১৫]

৭.

রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধে যেসব কুসংস্কার ও বিজ্ঞান-চেতনা-বিরোধী ঘটনাবলীর বিরুদ্ধে লিখেছিলেন, ৮৮ বৎসর পর তা আমাদের মাঝ থেকে আজও বিলুপ্ত হয়নি। বরং ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও বিজ্ঞান-বিরোধিতা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চাপে আজ তা শাখা, প্রশাখায় বিস্তৃত

হয়েছে। পীর-আওলিয়াদের কেরামতির প্রতি এদেশের উচ্চশিক্ষিতের যে বিশ্বাস, তা মধ্যযুগের ইউরোপের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাই লুই পাস্তুর নিজে অত্যন্ত ধর্মভীরু হওয়া সত্ত্বেও তিনি ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের মিলনের চেষ্টার বিরোধিতা করে লিখেছিলেন, "কেবল বিপথগামী মনই বিজ্ঞানের জগতে ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটাতে চেষ্টা করেন। তাঁরা আরো বেশী বিপথগামী যাঁরা উল্টোটি করেন অর্থাৎ ধর্মের জগতে বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা করেন। কারণ তারা বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে বেশি শ্রদ্ধা করেন।"[১৬]

একজন ব্যক্তি, একজন বিজ্ঞানী যদি বিজ্ঞানমনস্ক না হয় তাহলে সমাজের ও রাষ্ট্রের তেমন কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু একটি সমাজ, একটি রাষ্ট্র কিংবা একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ যদি বিজ্ঞানমনস্ক না হয়; না হয় যুক্তিবাদী, তাহলে সেই সমাজ, রাষ্ট্র বা ধর্ম সম্প্রদায়ের সমূহ বিপদ অনিবার্য। এ বিষয়ে দুটি কথা বলে শেষ করবো। ৮ম, ৯ম ও ১০ম শতকে মুসলমানদের বিজ্ঞান-তৎপরতার কথা আমরা আজও গর্বভরে উচ্চারণ করি। তারপর কেন আমরা হারিয়ে গেলাম, সেকথা মুসলিম আলেম সম্প্রদায় খুব কমই আলোচনা করেন। তাঁরা কেবল অতিতের তিনশ বছরের স্বপ্ন দেখেন। প্রফেসর আবদুস সালাম, বিশ শতকের একমাত্র মুসলিম নোবেল-বিজয়ী বিজ্ঞানী এ নিয়ে প্রচুর ভেবেছেন এবং লিখেছেন। তেমনি একটা লেখা 'Islam and Science' ১৯৮৪ সালে লিখেছিলেন,

"Of the major civilizations on this planet, science is the weakest in the Islamic Commonwealth. Unfortunately, some of us Muslims believe that while technology is basically neutral, and that its excess can be tempered through the adherence to the moral precepts of Islam, science - on the contrary – is value-loaded. It is believed that modern science must lead to 'rationalism', and eventually apostasy; that scientifically trained men among us will 'deny' the metaphysical presumptions of our culture."[১৭]

মুসলমানদের ভয় বিজ্ঞান পড়লে তাদের মধ্যে যুক্তিবাদের প্রসার ঘটবে, একসময় তারা ধর্ম ত্যাগ করতে পারে, আমাদের ধর্মের আধিভৌতিক সিদ্ধান্তগুলি অস্বীকার করতে পারে। সালাম সেদিন যা বলেছিলেন তা মিথ্যা নয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৮৩ সালে কুয়েতে অনুষ্ঠিত ইসলামি বিজ্ঞান সম্মেলনে। আরব ভূমির ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা সেখানে ইসলামি বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পথে বাধাগুলি শনাক্ত ও তা দূর করার জন্য মিলিত হয়েছিলেন। কিন্তু আলোচনা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে একটি প্রশ্নকে ঘিরে, 'Is Science Islamic?' The Saudis held that pure science tend to produce 'Mu'tazilite tendencies' potentially subversive of belief. Science is profane because it is secular; as such – it goes against Islamic beliefs."[১৮] মুতাজিলা সম্প্রদায়ের প্রতি সাচ্চা মুসলমানদের ক্ষোভ এখনও নিরসন হয়নি। বিজ্ঞানে যা কিছু অবদান ঐ তিনশ বছরে তার সবটাই মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মানুষের। ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ সবাই মুতাজিলা ছিলেন - যুক্তিবাদী। সেদিন যুক্তিবাদকে টুটি চেপে হ্যা করার পরিণতি মুসলমানরা আজও ভোগ করছে। সালামের কথা দিয়েই লেখাটি শেষ করি। তিনি বলেছেন,

"religious orthodoxy and the spirit of intolerance are two of the major factors responsible for killing the once flourishing enterprise of science in Islam."[১৯]

তথ্যনির্দেশনা

সূচনাবক্তব্য

১. Thomas S. Kuhn, 'The Structure of Scientific Revolutions', The University of Chicago Press, 2nd Edition, 1970, USA.

২. Semyon Mikulinsky, History of Natural Science As A Science: Present State and Theoretical Problems 'Soviet Studies in the History of Science', USSR Academy of Science Moscow, 1977, p.8

৩. George Sarton, 'History of Science : Ancient Science Through The Golden Age of Greece', Harvard University Press, Cambridge, 1959.

৪. J. D. Bernal, 'Science in History', 4 Volumes, Penguin Books, 1969

৫. George Sarton, প্রাগুক্ত, p. 3.

৬. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য প্রচুর বই আছে। তার মধ্যে – a. Emile Durkheim এর 'The Elementary Forms of The Religious Life', The Freepress New York, 1965; b. Sir James Frazer এর 'The Golden Bough : A History of Myth and Religion', Chancellor Press, 1994, Great Britain; c. V. Gordon Child এর 'Man Makes Himself', Walts & co., 39, Parker Street, London, WC2, 1965 ও 'What Happened in History', Penguin Books 1937; d. Lewis Henry Morgan, 'Ancient Society : Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization', First-published in 1877, Macmilan & co. London; e. F. Engles, 'The Origin of the Family, Private Property and the State (1884), Collected Work of Marxs & Engles, Progress Publishers, Moscow; f. A.S. Bogomolov, History of Ancient Philosophy, Progress Publishers, Moscow, 1985.

৭. এই আংশের জন্য দেখুন Gordon Child এর 'What Happened in History'র অনুচ্ছেদ X, Government, Religion and Science in the Iron Age, পৃষ্ঠা 204 – 229.

৮. M. Rosenthal and P. Yudin, 'A Dictionary of Philosophy', Progress publisher, Moscow, 1967, p. 485.

৯. সমরেন্দ্রনাথ সেন, 'বিজ্ঞানের ইতিহাস', শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা, জনুয়ারী ১৯৯৪ পৃ: ২২৭-২২৯.

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ', রবীন্দ্ররচনাবলী – ১৪, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪০৪

১১. Stella Van Patten Henderson, 'Introduction to Philosophy of Education', The University of Chicago Press, Chicago & London, 1947, p. 9

১২. Steve Bruce, 'Religion in the Modern World: from Cathedrals to Cults', Oxford University Press, Oxford & New York, 1996, p. 25

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা

১. Pervez Hoodbhoy, 'Islam and Science: Religious Orthodoxy and The Battle for Rationality', Zed Book Ltd, London and New Jersey, 1991, Forward by Mohammed Abdul Salam, X

২. ঐ, পৃষ্ঠা Forward IX

৩. Albert Einstein, 'Religion and Science: Irreconcilable? In Ideas and Opinions', Rupa Co., 20th impression 2005, p. 52

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কলাবিদ্যা', রবীন্দ্ররচনাবলী, পঞ্চদশখন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০, পৃষ্ঠা ৮৭১

৫. V. I. Lenin, 'Collected Works vol-14, Materialism and Empirio-Criticism, Progress Publishers, Moscow, 1972, p. 53

৬. ঐ

৭. ঐ, পৃষ্ঠা – ৭৫

৮. কার্ল পপার : নির্বাচিত দার্শনিক রচনা – প্রথম খন্ড, ভাষান্তর : আমিনুল ইসলাম ভুইয়া, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০০৭, কার্ল পপার : ক্ষান্তিহীন অন্বেষী, পৃ. ছাব্বিশ.

৯. Steven Weinberg, 'The First Three Minutes: A Modern View of the Origin of Universe', Flemingo, 1993, p. 14-15

১০. ঐ, পৃষ্ঠা – ১৭

১১. শহিদুল ইসলাম, 'বিজ্ঞানের দর্শন (প্রথম খন্ড)', শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ২০৩

১২. M. Rosenthal and P. Yudin, 'A Dictionary of Philosophy', Progress Publishers, Moscow, 1967, p. 19

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষার মেলা', রচনাবলী চতুর্দ্দশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃ. ৩৮৯

১৪. শহিদুল ইসলাম, 'বিজ্ঞানের দর্শন (দ্বিতীয় খন্ড)', শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ২০০৭, পৃ. ৩৫

১৫. ঐ, পৃ. ৩৮

১৬. ঐ, 'বিজ্ঞানের দর্শন (১ম খন্ড), শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ২০০৫, পৃ. ২৩৯

১৭. 'Ideals and Realities : Selected Essays of Abdus Salam', Editor : C. H. Lai, World Scientic Publishing Co. Pvt. Ltd., Singapore, 1987, p. 183

১৮. Pervez Hoodbhoy, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

১৯. ঐ, পৃ. Forward p. IX

ড. শহিদুল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। সর্বাধিক আলোচিত প্রকাশিত গ্রন্থ : *বিজ্ঞানের দর্শন*, দুই খণ্ড, শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ঢাকা। প্রবন্ধটি ২৮ জুন ২০০৯, রবিবার, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশে 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা' শিরোনামে পঠিত।